বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ইসলাম সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদকে প্রত্যাখ্যান করে

[বাংলা - bengali - البنغالية]

সংকলক: আলী হাসান তৈয়ব

সম্পাদনা : মো: আবদুল কাদের

2011- 1432

IslamHouse.com

﴿ الإسلام يرفض الإرهاب والعنف ﴾

« باللغة البنغالية »

علي حسن طيب

مراجعة: محمد عبد القادر

2011 - 1432

IslamHouse.com

ইসলাম সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদকে প্রত্যাখ্যান করে

আলী হাসান তৈয়ব

ইসলাম যে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদকে সমর্থন করে না তা বলার অপেক্ষা রাখে না । যে ধর্মের নামেই রয়েছে শান্তির সুবাস, যে ধর্মের নবীকেই প্রেরণ করা হয়েছে জগতবাসীর জন্য শান্তি ও রহমত স্বরূপ[1], সে ধর্ম সম্পর্কে এমন অপপ্রচার একান্তই বিদ্বেষপ্রসূত । ইসলাম বিদ্বেষী ভাইদের অপপ্রচারে যাতে সরলমনা মুসলিম ভাই-বোনেরা বিভ্রান্ত না হন, তাই আজ পবিত্র কুরআনে এদু'টি শব্দ কতভাবে এসেছে তা আলোচনা করে এ ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান তুলে ধরার প্রয়াস পাব এ নিবন্ধে ইনশাআল্লাহ।

অনেক রাজনৈতিক নেতা ও চিন্তাবিদই আরবী 'উনুফ' বা 'সহিংসতা' (Violence) শব্দ ও 'ইর'আব' বা 'আতঙ্কসৃষ্টি' (Terrorism) শব্দের মধ্যে, তেমনি 'উনুফ' বা 'সহিংসতা' ও 'আল-ইর'আব আল-উদওয়ানী' বা 'আগ্রাসন' শব্দের মধ্যে এবং 'উনুফ' বা 'সহিংসতা' ও 'আল-ইর'আব আয-যরুরী' বা 'ত্রাস' শব্দের মধ্যে পার্থক্য করেন না।

বস্তুত বিদেশি শব্দ সন্ত্রাস বা Terrorism-এর আরবী প্রতিশব্দ 'ইরহাব' নয়; 'ইর'আব'। কেননা ('ইরহাব' শব্দের ধাতুমূল তথা) 'রাহ্ব' (الرهب) শব্দ ও তা থেকে নির্গত শব্দাবলি পবিত্র কুরআনে ত্রাস নয় বরং সাধারণ ভীতি-সঞ্চার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাতে একটি নির্দিষ্ট বস্তুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অর্থ মিশে থাকে। অন্যের বেলায় মানুষ শব্দটি ব্যবহার তার অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাবার জন্য[2]। আর এ শব্দ কিন্তু 'র'ব' (الرعب) শব্দ থেকে ভিন্ন অর্থ বহন করে। কেননা 'র'ব' শব্দের অর্থ তীব্র ভীতি-সঞ্চার অর্থাৎ ত্রাস ও আতঙ্ক সৃষ্টি করা[3]। মানুষ এ শব্দটিকে ব্যবহার করে অন্যকে শায়েস্তা করা এবং তাদের ওপর জুলুম চালানোর জন্য। আবার এর কতক সংঘটিত হয় উদ্দেশ্যহীন, অনির্দিষ্ট ও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কারণে[4]।

তবে এতদসত্ত্বেও 'ইরহাব' ও ইর'আব' শব্দ আরবী ভাষায় ধাতুগতভাবে শুধু মন্দ বা শুধু ভালোর জন্য ব্যবহৃত হয় না। এদুটি এমন মাধ্যম যা ভালো বা মন্দের পক্ষাবলম্বন করে না। উভয় শব্দ সত্য প্রতিষ্ঠা ও অন্যায় প্রতিরোধ এবং নিপীড়িতের সাহায্যার্থে ব্যবহৃত হয়। তেমনি শব্দদুটিকে নিরপরাধ নিরস্ত্র মানুষের ওপর অত্যাচার , অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ও অধিকার হরণ এবং তাদের ভূমি দখলের জন্যও ব্যবহৃত হয়।

তবে 'উনুফ' ও 'ইরহাব' শব্দের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। 'উনুফ' অর্থ চিন্তা, মতবাদ, দর্শন কিংবা সাধারণ বা বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে সহিংস মাধ্যম বা উপায় অবলম্বন করা। যেমন : আঘাত , শারীরিক নির্যাতন বা অস্ত্র ব্যবহার। পক্ষান্তরে 'ইরহাব' ও 'ইর'আব' শব্দদুটি এর চেয়ে ব্যাপক অর্থ বহন করে। কারণ তা হতে পারে সহিংস উপায়ে আবার হতে পারে অহিংস উপায়ে। যেমন : আকার-

---

[1]. পবিত্র কুরআনের সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত : ১০৭।

[2]. সূরা তাওবা : ৩৪; নাহল : ৫১; আম্বিয়া : ৯০; কাসাস : ৩২; হাদীদ : ২৭; হাশর : ১৩।

[3]. সূরা আলে-ইমরান : ১৫১; আনফাল : ১২; আহযাব : ২৬; হাশর : ২।

[4]. ইবন মানযুর, আল-বুসতানী।

ইঙ্গিতের মাধ্যমে ভয় দেখানো। (তাকে এভাবে ইঙ্গিতে জবাই করার ভয় দেখানো।) অথবা কথার দ্বারা ভয় দেখানো। যেমন : অর্থনৈতিকভাবে বয়কটের হুমকি , কঠোরতা আরোপের হুমকি, না খেয়ে মারার হুমকি কিংবা পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের হুমকি ইত্যাদি। 'ইরহাব' ও 'ইর'আব' শব্দদুটি ভেটোর ক্ষমতা প্রয়োগ অথবা জালেমের নিন্দা প্রস্তাবে ভোট দেয়াকেও অন্তর্ভুক্ত করে। অসত্য অভিযোগ প্রচারের মাধ্যমেও 'ইরহাব' ও 'ইর'আব' সংঘটিত হতে পারে। যেমন : টার্গেট গোষ্ঠীর সুনাম ক্ষু ণ্ন করতে বা তার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়াতে অপপ্রচার ও প্রচলিত মিডিয়া যুদ্ধের কৌশল গ্রহণ করা।
এই 'ইরহাব' ও 'ইর'আব' কখনো হামলার শিকার ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিক হত্যা করে না। বরং তাকে দীর্ঘ শাস্তি ও ধারাবাহিক নির্যাতন করে ধুঁকিয়ে ধুঁকিয়ে মারে। অর্থাৎ এ দুটি কখনো তৎক্ষণাৎ না মেরে ধীরে ধীরে মৃত্যু ডেকে আনে। এটি করা হয় তাকে গৃহহীন অবস্থা ও ক্ষুধার মুখে ঠেলে দেয়ার মাধ্যমে।

আমাদের চারপাশে লক্ষ্য করলে দেখা যায় , ব্যাপকার্থে যারা 'ইরহাব' ও 'ইর'আব' করছে- যার মধ্যে রয়েছে সত্য প্রতিষ্ঠা করা ও নির্যাতন প্রতিরোধ করা অথবা অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়া ও অত্যাচারীকে আশ্রয় দেয়া- এরা প্রধানত তিন দলে বিভক্ত। যথা :

১. যারা নীতি-নৈতিকতার বাইরে গিয়ে শব্দদুটিকে ব্যবহার করে তাদের নির্যাতন বা অন্যায়কে বৈধতা দেবার জন্য। আখিরাতে বিশ্বাসী হোক বা না হোক- এরা মানবস্বভাব ও ঐশী শিক্ষার বিরোধী। যার মধ্যে ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শও রয়েছে।

২. যারা যথাসাধ্য প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে থেকে শব্দদুটি ব্যবহার করে আত্মরক্ষা কিংবা অক্ষম ও নিরপরাধ লোকদের থেকে জুলুম প্রতিরোধের উদ্দেশে। তারা আখিরাত বা শাশ্বত জীবনে বিশ্বাস রাখে না। তারা এসব করে আল্লাহ প্রদত্ত সুস্থ বিবেকের তাড়নায়।

৩. যারা শব্দদুটি ব্যবহার করে আত্মরক্ষা বা অক্ষম ও নিরপরাধ লোকদের ওপর জুলুম প্রতিরোধে যথাসম্ভব শরীয়ত ও প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে থেকে। তারা বিশ্বাস করে এজন্য তারা আখিরাত বা শাশ্বত জীবনে বিশাল প্রতিদান লাভ করবে। অতএব, তারা এসব করে সুস্থ বিবেক ও অনন্ত জীবনের বিশাল প্রতিদানের প্রত্যাশায়।

এ জন্যই দেখা যায় শেষোক্ত দলটি আত্মোৎসর্গ ও আত্ম নিবেদনে সবচে বেশি আগ্রহী ও সাহসী হয়। কেননা ,তার দৃষ্টিতে পার্থিব জীবন কেবল উসিলা বা বিধেয় মাত্র ; মাকসাদ বা উদ্দেশ্য নয়। সম্ভবত এটিই মানুষকে নিজেদের সম্মানিত স্থান , নিজেদের মাতৃভূমি ও নিপীড়িত স্বজনদের রক্ষায় প্রাণোৎসর্গমূলক জিহাদী কার্যক্রমে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে।

সাধারণভাবে আত্মঘাতমূলক তৎপরতার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামের আইন ব্যাখ্যাকারী তথা ফিকহবিদদের মতভিন্নতা হেতু বিভিন্ন হয়। তাদের অনেকে কাজটিকে বৈধ বলেন এবং এ কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধও করেন। যতক্ষণ তা হয় আত্মরক্ষার্থে এবং অন্যায়ভাবে অন্যের ওপর সীমালঙ্ঘনের ইচ্ছে ছাড়া। উপরন্তু তা নিরপরাধ ব্যক্তির বিরুদ্ধেও পরিচালিত না হয় , যাদের ওপর ইসলাম যুদ্ধক্ষেত্রে পর্যন্ত হামলার অনুমতি দেয় না। যেমন : নারী , শিশু, বৃদ্ধ ও নিরস্ত্র ব্যক্তি। অনুরূপভাবে সব রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই মানবরচিত আইন সেনাদেরকে নিজের দৃষ্টিতে বৈধ যুদ্ধক্ষেত্রে জীবনের ঝুঁকি নিতে এমনকি জীবন উৎসর্গ করতে পর্যন্ত উৎসাহিত করে। পক্ষান্তরে অনেক শরীয়তবিদ কাজটিকে আত্মহত্যার সঙ্গে তুলনা করে হারাম বলে অভিহিত করেন। তাদের মতে , জীবনের ঝুঁকি নেয়া ভিন্ন

জিনিস। কারণ সেখানে জীবন রক্ষার সম্ভাবনাই প্রবল। তাছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঝুঁকি গ্রহণকারীর মৃত্যুর কোনো অভিপ্রায়ই থাকে না।

আসমানী রিসালত বা ঐশী বার্তাপ্রাপ্ত ধর্ম পালনকারী ব্যক্তিমাত্রেই জানেন , দুনিয়ার এ জীবন মূলত একটি পরীক্ষাতুল্য। এর মাধ্যমে চিরস্থায়ী জীবনে পুরস্কারযোগ্য সৎকর্মশীল এবং অনন্ত জীবনে তিরস্কারযোগ্য অসৎ ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য রচনা করা হয়। আর সত্যপন্থী ও মিথ্যাপন্থীর সংঘাত এবং নিপীড়ক ও নিপীড়িতের দ্বন্দ্ব এ পরীক্ষার একটি অংশ মাত্র। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (40)

'আর আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা দমন না করতেন , তবে বিধস্ত হয়ে যেত খৃস্টান সন্ন্যাসীদের আশ্রম , গির্জা, ইয়াহূদীদের উপাসনালয় ও মসজিদসমূহ- যেখানে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়।'[5]

'ইরহাব' ও 'ইর'আব' কখনো সংঘটনের ইচ্ছা ছাড়া সংঘটিত হতে পারে। ভুলক্রমেও হতে পারে কখনো। তবে এ ব্যাপারে তাকে সতর্ক করার পরও যদি সে এমন কাজ থেকে নিবৃত না হয় , যা 'ইরহাব' বা 'ইর'আব'-এর কারণ হয়, তখন তা ইচ্ছাকৃত 'ইরহাব' বা 'ইর'আব' বলেই গণ্য হবে। ইসলাম যেহেতু মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতের ব্যাপক শান্তি কিংবা অন্তত নানা ধর্মের মানুষের মধ্যে শুধু দুনিয়ার শান্তির প্রতি আহ্বান জানায়। তাই এ ধর্ম অন্যের ওপর অত্যাচার বা সীমালঙ্ঘনমূলক 'ইরহাব' ও 'ইর'আব' সংঘটনকে কঠোরভাবে হারাম ঘোষণা করে। তীব্রভাবে একে প্রত্যাখান করে এবং সীমালঙ্ঘন বা উৎপীড়নমূলক 'ইরহাব' ও 'ইর'আব' এর জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করে। হ্যা, ইসলাম এতদুভয়ের অনুমতি দেয় ঠিক ; তবে তা শাস্তিকে অপরাধী পর্যন্ত সীমিত রাখা এবং অনুমোদিত ক্ষেত্র অতিক্রম না করার শর্তে। অনুমোদিত ক্ষেত্র হলো , আত্মরক্ষা, শত্রু দমন ও নির্যাতিতের সাহায্যের জন্য। বিশেষত জুলুম প্রতিরোধের কোনো ক্ষমতাই সেসব দুর্বল ও অক্ষম ব্যক্তির নেই। একেই ইসলামে 'জিহাদ'[6] অথবা 'কিতাল ফী সাবীলিল্লাহ' বলা হয়। যার উদ্দেশ্য কেবল নিরস্ত্র, অক্ষম ও দুর্বলদের থেকে জুলুম তুলে দেয়া। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا (75)

'আর তোমাদের কী হল যে , তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছ না! অথচ দুর্বল পুরুষ , নারী ও শিশুরা বলছে, 'হে আমাদের রব, আমাদেরকে বের করুন এ জনপদ থেকে ' যার অধিবাসীরা যালিম এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করুন। আর নির্ধারণ করুন আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী।'[7]

---

[5]. হজ : ৪০।

[6]. যিনিই আরবী 'জিহাদ' শব্দ ও এর ধাতুমূল নিয়ে চিন্তা করবেন, দেখবেন তাতে পূর্বে সংঘটিত কোনো কিছুর প্রতিরোধ অর্থ লেপ্টে আছে। কোনো হামলার সূচনার অর্থ নেই তাতে। যেমন দেখতে পারেন, ইবনুল কায়্যিম : ৩/৫-৯।

[7]. নিসা : ৭৫।

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنِّي حَرَّمْتُ عَلَى نَفْسِي الظُّلْمَ وَعَلَى عِبَادِي فَلاَ تَظَالَمُوا.

'হে আমার বান্দা , আমি নিজের ওপর জুলুম হারাম করেছি এবং তোমাদের জন্যও একে হারাম করেছি। অতএব তোমরা একে অপরের ওপর জুলুম করো না।'[8]

এ কারণেই মুসলমানদের ক্ষেত্রে এমন বিচিত্র নয় যে তারা তাদের প্রজা সাধারণ (যিম্মী) বা সংখ্যালঘুদের বাঁচাতেও জিহাদ করছে।[9] এককথায়, কারও ওপর জুলুম চালানোর জন্য নয় ; ইসলামে 'জিহাদ' নামক বিধান রাখা হয়েছে বৈধ প্রতিরোধের জন্য। আর নির্যাতন প্রতিরোধের পদক্ষেপকে গণতান্ত্রিক ও অন্যান্য দেশের মানব রচিত সকল ব্যবস্থাই সমর্থন করে। এ উদ্দেশ্যেই তো সকল রাষ্ট্র শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করে। নিজেকে সুসজ্জিত করে বিধ্বংসী সব অস্ত্র দিয়ে।

আত্মরক্ষামূলক এবং আক্রমণাত্মক ভীতিপ্রদর্শনের মধ্যে পার্থক্য করবো কিভাবে

ইতোমধ্যে আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়েছে , ভীতিপ্রদর্শন ও ভয় দেখানো শব্দটিকে সন্ত্রাসী (জালেম) ও সন্ত্রাসের শিকার (মাজলুম) উভয়েই ব্যবহার করে। এখন প্রশ্ন হলো , তাহলে আমরা এদুয়ের মধ্যে জালেম ও মজলুমকে পার্থক্য করবো কিভাবে?

আত্মরক্ষার্থে ভীতিপ্রদর্শন আর সন্ত্রাসমূলক ভীতিপ্রদর্শনের মধ্যে মোটাদাগে পার্থক্য এই :

অন্যের বিরুদ্ধে কে প্রথমে ত্রাস বা সন্ত্রাসের সূচনা করেছে ? যে সূচনা করেছে সে চর্চা করছে আক্রমণাত্মক ভীতিপ্রদর্শন আর যিনি প্রতিরোধ করছেন তিনি হলেন আত্মরক্ষাকারী। একইভাবে যিনি জালেমকে বস্তুগত বা নৈতিকভাবে সমর্থন করবেন তিনি আক্রমণাত্মক ভীতিপ্রদর্শনকারীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবেন। পক্ষান্তরে যিনি মজলুমকে সাহায্য করবেন তিনি আত্মরক্ষাকারী বলে গণ্য হবেন। এটা ঠিক সচরাচর সহজে সূচনাকারী শনাক্ত করা যায় না। কারণ , জালেম পক্ষের গরিমা ও অহঙ্কার বেশি হয়। নিপীড়কের শক্তি হয় পর্বতপ্রমাণ। এমনকি মজলুমের চেয়ে জালেমের প্রমাণও হয় দৃঢ়তর। তথাপি বিষয়টি অন্যভাবে খোলাসা করা সম্ভব।

তবে সূচনাকারী শনাক্ত করা মুশকিল হলে অন্যভাবে তা চিহ্নিত করা যায়। যেমন আমরা উভয় পক্ষের মধ্যে মিমাংসার চেষ্টা করে দেখবো। যে পক্ষ ইনসাফভিত্তিক সালিশের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানাবে সে-ই জালেম, হোক সে মুসলিম। কারণ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9)

'আর যদি মুমিনদের দু'দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের ওপর বাড়াবাড়ি করে , তাহলে যে দলটি বাড়াবাড়ি করবে , তার বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর , যতক্ষণ না সে দলটি আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। তারপর যদি

[8]. মুসলিম : ৬৭৪০।

[9]. ইবন কুদামা মুকাদ্দেসী; ইবন তাইমিয়া হাররানী; আশ-শিরাজী; আল-হানাফী।

দলটি ফিরে আসে তাহলে তাদের মধ্যে ইনসাফের সাথে মীমাংসা কর এবং ন্যায়বিচার কর। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়বিচারকারীদের ভালোবাসেন।'[10]

সন্ত্রাস ও আগ্রাসী হামলা কখনো ভিন্ন রূপ ধারণ করে। তা হলো , অভিযোগ প্রমাণ না করেই কোনো মানুষকে শাস্তি দেয়া। কিংবা কোনো ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযোগের ওপর নির্ভর করে একটি জাতিকে বা পুরো মানব সমাজকে শাস্তি দেয়া। এ কাজ ইসলাম কিছুতেই সমর্থন করে না। শাস্তি দিলে তা অবশ্যই অনুমোদিত সীমা অতিক্রম না করতে হবে। অভিযোগ প্রমাণের পরও শাস্তি থাকতে হবে যুক্তিগ্রাহ্য সীমারেখার ভেতর। পরন্তু শাস্তির প্রকৃতিও হওয়া চাই অভিন্ন। অত্যাচারী বা জালেমের ভিন্নতায় তা যেন ভিন্ন ভিন্ন না হয়। অতএব যালেম দুর্বল হলে বা মিত্র না হলে তার শাস্তি কঠোর হবে না। তেমনি যালেম শক্তিধর, মিত্র বা তার কাছে কোনো স্বার্থ থাকলে তার শাস্তি লঘু করা হবে না। সর্বদা শাস্তি হবে ইনসাফের আলোয় উদ্ভাসিত। কেননা আল্লাহ তা 'আলা আমাদেরকে সর্বাবস্থায় ইনসাফের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (8)

'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায়ের সাথে সাক্ষদানকারী হিসেবে সদা দণ্ডায়মান হও। কোন কওমের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে কোনভাবে প্ররোচিত না করে যে , তোমরা ইনসাফ করবে না। তোমরা ইনসাফ কর, তা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় তোমরা যা কর , আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।'[11]

তবে ইসলামের এসব সুস্পষ্ট নীতিমালা থাকার পরও মুসলিম নামধারী অনেকে ইসলামের মহান আদর্শকে উপেক্ষা করে। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অমান্য করে তারা সন্ত্রাস ও আগ্রাসনের পথ বেছে নেয়। এটা স্বাভাবিক যে প্রতিটি রাষ্ট্রই তার নাগরিকদের সঠিক আচরণ শিক্ষা দেয়। তারপরও তো প্রতিটি দেশেই অপরাধীতে পূর্ণ অনেক কয়েদখানা থাকে। তাই বলে কি আমরা বলবো যে অমুক জাতি পুরোটাই অপরাধী? কিংবা অমুক জাতি তার সদস্যদের অপরাধ শিক্ষা দেয় ? আমেরিকার এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ১৯৮২-১৯৯৬ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৭৫টি অন্যায় হামলা বা সন্ত্রাস সংঘটিত হয়েছে। এর অধিকাংশ সংঘটিত হয়েছে খ্রিস্টান দ্বারা, তারপর ইহুদিদের দ্বারা। তাই বলে কি আমরা বলবো সকল খ্রিস্টান বা সব ইহুদিই সন্ত্রাসী বা আগ্রাসী? অবশ্যই না।

অতএব আজ যারা ইসলামের সঙ্গে সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদের সম্পর্ক আবিষ্কার করতে চান, কুরআনের ভেতর অনুবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে মানবাধিকার পরিপন্থী কথা তালাশ করে হয়রান হন, তারা হয়তো অমুসলিমদের প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে কিংবা ইসলাম বিরুদ্ধ শক্তির প্রভাবে এমনটি করে থাকেন। ইদানীং মুসলিম নামধারী অনেককেও দেখা যায় ইসলাম-আরাতীদের কণ্ঠে কণ্ঠ মেলাতে । তাদের সুরে কথা বলতে। বরং ইসলামের অনিষ্ট চিন্তায় অমুসলিমদের চেয়ে এসব মুসলিম নামধারীরাই একধাপ এগিয়ে। তাদের জন্য থাকছে আমাদের বুকভরা ভালোবাসা, একরাশ করুণা আর অনন্ত শুভ কামনা ।

---

[10]. সূরা আল-হুযরাত, আয়াত : ০৯।

[11]. সূরা আল-মায়িদা, আয়াত : ৮।

আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এবং সকল মুসলিমকে হেদায়াত দিন । সবাইকে ইসলাম বিরোধী শক্তির অপ্রচারের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার তাওফীক দিন। আমীন।

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার : ড. সাঈদ ইসমাঈল চীনী, তাসাউলাত জাদালিয়্যাহ হাওলাল ইসলাম ও তালীকাত ।